প্রতিধ্বনি the Echo

A Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: www.thecho.in

সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’ উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় সমাজ

নীতিশ দাশ
পিএইচ ডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

Abstract

Samaresh Basu is one of the renowned novelists of modern Bengali literature. Apart from Tarashankar and Manik Bandhopadhya, Samaresh Basu is the most versatile and popular among the modern novelists. His novel ‘Ganga’ written in the post-colonial period is proved to be a milestone in theme and treatment. It is one of the best novels in Bengali related with the life of the fisherman and others living beside river. In the capitalist society it has been observed that the subaltern group work very hard but they are very much under privileged and deprived of the minimum opportunities of life. The middleman snatches away the profit from these poor fishermen and they remain poor throughout their lives and this way carry the burden of loan from one generation to other. Even then they have their own dreams, expectation from life, and struggle for emancipation which has been portrayed in a befitting manner in this novel. Based on secondary data the paper aims to study role of Ganga River on life of fishermen as is explored in Samaresh Basu’s novel ‘Ganga’.

সাহিত্য সংস্কৃতির দিকে আমরা যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে দেখতে পাই সাহিত্যের একটা বিশাল অংশ অধিকার করে আছে নিম্নবর্গীয় চরিত্র ও চিন্তা চেতনা। আর সাহিত্য যেহেতু সমাজেরই দর্পন তাই সমাজেরই একটা বৃহৎ জায়গা জুড়ে রয়েছে এই নিম্নবর্গীয়রা ।

বর্তমানে নিম্নবর্গ বলতে আমাদের মনে যে ধারণার সৃষ্টি হয় তার মূল কিন্তু এই প্রাগার্য জাতি সমূহ। এই প্রাগার্য বা অনার্য জাতিগুলিই পরবর্তীকালে নিম্নবর্গ বলে পরিচিতি লাভ করেছে।

ভারতে নিম্নবর্গের ইতিহাস চিন্তাচর্চার একটি স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল ধারা প্রচলিত হয়েছে গত দেড়-দুই দশকে । ১৯৮২ সালে ‘সাবলটার্ন স্টাডিজ’-এর প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩ সালে প্রথম সাবলটার্ন স্টাডিজ সম্মেলন ও গত বারো বছরে আট খণ্ড ‘সাবলটার্ন স্টাডিজ’ সংকলন প্রকাশিত হওয়ার ঘটনা এই ইতিহাস চর্চার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ পথটি চিহ্নিত করে। গত পনেরো বছরে জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, ডেভিড হার্ডিম্যান, শাহিদ আমিন, ডেভিড আর্নল্ড, রণজিৎ গুহ প্রমুখ গবেষকদের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণী ইতিহাসবোধ এই ধারাটিকে পুষ্ট করেছে। সাম্যবাদী দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশির দর্শনে যে সাবলটার্ন হিস্ট্রির সূত্রপাত, তারই নানা অব্যাখ্যাত ইঙ্গিত ও সূত্রের সময়োপযোগী পরিমার্জন ও বিশ্লেষণের মধ্যে থেকে উঠে আসা নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার এই ধারাটি, নিঃসন্দেহে বিবর্তনশীল সামাজিক বিন্যাস ও সামাজিক সম্পর্কের জটিল ও বহুস্তর বাস্তবতাটিকে সত্যের অনেক কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছে।

সাবলটার্ন (নিম্নবর্গ) ইংরেজি ভাষায় শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে। 'সাবলটার্ন' শব্দটির প্রকৃত অর্থ সামরিক সংগঠনের অধস্তন কর্মী। ইংরেজিতে এর সমার্থক শব্দ 'সাবর্ডিনেট' অর্থাৎ অধীন। ইতালির কমিউনিস্ট নেতা আন্তোনিও গ্রামশি তাঁর 'কারাগারের নোট বই' তে ডমিন্যান্ট শ্রেণির বিপরীত শ্রেণি হিসেবে সাবলটার্ন শব্দটির প্রয়োগ করেছেন । "গ্রামশি সাবলটার্ন শব্দটি কখনো প্রলেটারিয়্যাট এর প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করেছেন , আবার কখনো বা শুধু শিল্পশ্রমিক নয়, সামাজিক বিবর্তনের যে কোনো স্তরেই প্রভুত্ব/অধীনতার সম্পর্কন্যাসে কর্তৃত্বকারী শক্তির বিপরীত গোষ্ঠী হিসেবে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।"[১]

সম্প্রতিকালে ভারতবর্ষের সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে 'সাবলটার্ন' শ্রেণির ধারণাটিকে নতুনভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। রণজিৎ গুহ এর বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন 'নিম্নবর্গ'। গ্রামশির ইঙ্গিতগুলিকে অনুসরণ করেই এই নিম্নবর্গ ধারণাটির উদ্ভব । কিন্তু তার প্রয়োগ ও বিস্তার করা হয়েছে ভারতবর্ষের সমাজ ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে। উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ এর সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়েছে সামাজিক সম্পর্কের সেই সমতলে যেখানে ক্ষমতাই হল মূল কথা। যেখানে প্রভুত্ব/ অধীনতার এক বিশিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সামাজিক সম্পর্কটি বাঁধা থাকে। আবার উচ্চবর্গ / নিম্নবর্গ শব্দ দুটিকে শাসক শ্রেণি / শাসিত শ্রেণির প্রতিশব্দ হিসেবেও সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা চলে না।

ধর্মকে আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্যের সূচনা ঘটলেও নিম্নবর্গের মানুষের উপস্থিতি সেখানে লক্ষ্য করার মতো । ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যেও বিশেষত আদি যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত , বাংলা সাহিত্যের মধ্যে নিম্নবর্গের মানুষ কোনো না কোনো ভাবে উঠে এসেছে। তৎকালীন সমাজ পরিবেশে নিম্নবর্গের জীবন ধারার যে চিত্র পাওয়া যায় তার বিশেষ গুরুত্ব আছে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের মধ্যে যেমন আমরা নিম্নবর্গের মানুষজনকে দেখতে পাই তেমনি আধুনিক পর্বের প্রায় সব ধরনের সাহিত্যেই উঠে এসেছে এই নিম্নবর্গের সমাজভুক্ত মানুষেরা। এখানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করব আমাদের আলোচ্য সমরেশ বসুর বহু চর্চিত 'গঙ্গা' উপন্যাসে কিভাবে উঠে এসেছে নিম্নবর্গীয় সমাজ।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা উপন্যাসের জগতে অন্যতম প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু। তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর তিঁনিই সবচেয়ে বৈচিত্রপূর্ণ ও জনপ্রিয় লেখক । তাঁর 'গঙ্গা' উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের জগতে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ১৯৮০ সালে এই উপন্যাসের জন্য সমরেশ বসুকে 'আনন্দ পুরস্কারে' সম্মানিত করা হয় । বাংলা সাহিত্যের নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস ধারার সার্থক সংযোজন 'গঙ্গা' । মৎস্যজীবীদের একটি বিস্তৃত ও নিখুঁত চিত্র বিধৃত আছে এই 'গঙ্গা' উপন্যাসে। এই উপন্যাসের কুশীলব বাঙালি সমাজের প্রান্তবাসী মাছমারা ।

'গঙ্গার জল সাক্ষাৎ ভগবতীর। এত বিস্তার তুমি কোথায় পাবে । ভগবতীর জলে মাছ মারবে , তুমি মাছমারা, তার খাজনা নেবে মানুষে । বিল বলো, বাওড় বলো, তুমি নিজের হাতে গড়োনি। কিন্তু তার প্রাণী থেকে ঘাস কচুরিপানা, সবকিছুর খবরদারি করবে তুমি। গাঙ-বিল-বাওড়ে যে প্রাণ দেবে আর নেবে, তার ওপরে তোমার আইন খাটাতে চাও মানুষ হয়ে। খাজনা ধরো, ট্যাকসো ধরো। মাছ তুমি ছাড়োনি। কিন্তু ভাত না দিয়ে তুমি কিল মারার গোঁসাই। কীসে তোমার হক? না, তুমি জমা নিয়েছ, দেশের তুমি রাজা হয়েছ।

যে দৌলত তুমি দাওনি, আমার বাপ-পিতামোর কৌশল খাটিয়ে যাকে পাই, তার ওপরে তোমার খবরদারি। নির্যাতন করবে তুমি কেন? না,আমি মাছমারি । তোমার শক্তি আরও বড় , তুমি আমাকে মারো।''[২]

যুগ যুগান্তর থেকে চলে আসা শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এক কথায় বলতে গেলে সমাজে যারা দুর্গ, অপাংক্তেয় তারাই বঞ্চিত, নিপীড়িত। লেখক অত্যন্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিম্নবর্গীয় মাছমারাদের সমাজজীবনকে চিত্রিত করেছন আলোচ্য 'গঙ্গা' উপন্যাসে । সমরেশ বসু এই মাছমারা মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন, তাদের নৌকোয় অনেকদিন কাটিয়েছেন, মৎস্যজীবী মানুষদের

কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাদের জীবনের নানা দিক সম্বন্ধে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তাই মাছমারাদের জীবিকা সংস্থানের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, মাছমারাদের মাছ ধরার নানা উপকরণ, তাদের কথ্য ভাষা, শহরের অভিজ্ঞতা, কোথায় কিভাবে মাছ ধরতে হয় তার বিবরণ, বিভিন্ন ধরণের নৌকোর বর্ণনা আদি সমরেশ বসু খুব সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন 'গঙ্গা' উপন্যাসে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন – 'একটি বিশেষ অঞ্চলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার এরূপ নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ও অন্তর্গূঢ় প্রেরণা বাংলা উপন্যাসের অন্যত্র দুর্লভ । লেখক শুধু উহাদের জীবনযাত্রার বর্হিঘটনাই চিত্রিত করেন নাই, উহাদের মুখের ভাষা, অন্তরের অর্ধস্ফুট চিন্তা ও আবেগের স্পন্দন, উহাদের জীবনবোধের সমস্ত প্রাদোষান্ধকার অস্পষ্টতা ও রহস্যঘন নক্ষত্রদীপ্তি আমাদের নিকট অপূর্ব দক্ষতার সহিত উদঘাটিত করিয়াছেন।'[৩]

'গঙ্গা' উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে নিম্নবর্গীয় প্রান্তিকায়িত মাছমারাদের জীবন। লেখকের মতে, 'মৎস্যজীবীদের মাছধরার একটা বিশেষ মরশুমী যাওয়া আসাকে কেন্দ্র করেই গোটা কাহিনী গড়ে উঠেছে।' সমরেশ বসু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মালো-সমাজের আর্থিক অবস্থা ও অবস্থানকে চিত্রিত করেছেন। মাছমারারা সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করে, তথাপি ইলিশের মরশুমে প্রচুর উপার্জনের পরও ক'মাস পেট ভরে খেতে পায় না তারা, শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে মহাজনদের কাছে নৌকো বাঁধা দিতে হয়। নতুন করে মুচলেকা দিয়ে নৌকো ছাড়িয়ে আনতে হয় আষাঢ়ে ।

'গঙ্গা' উপন্যাসের মধ্যে একদিকে রয়েছে নদীর সঙ্গে জড়ানো মাছমারাদের জীবনের ঐতিহ্য-সংস্কার আর অপরদিকে মাটি ও জলে জীবনের সংগ্রাম, বিশ্বাস-ভালবাসা, ঘৃণা ও হতাশার চিত্র। মালো জাতির সার্থক উত্তরসূরী বিলাস। সে তার কর্ম পটুতায়, সাহসে ও অন্যায়ের প্রতিবাদের মধ্যদিয়ে তা প্রমান করেছে। আসলে মাছমারারা শুধু নামে মাত্র স্বাধীন, প্রকৃতপক্ষে তারা মহাজন ও পাইকারদের দাদন খাওয়া শ্রমিক মাত্র। মৎস্যজীবীরা শ্রম করে আর মহাজনেরা ঘরে বসে পুঁজির মুনাফা অর্জন করে। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিককে অভুক্তও থাকতে হয়। তথাপি তারা মহাজনের ঋণের কবল থেকে কোনোদিন মুক্তি পায় না। এত চাপের মধ্যে থেকেও মালোদের চোখে আছে স্বপ্ন, আছে আধীন জীবন থেকে মুক্তির আকাঙক্ষা । উপন্যাসের নায়ক বিলাসের মধ্যে তার প্রতিফলন দেখতে পাই-

'আমার প্রাণে সুখ নাই হে
বড় উথালি পাথালি আমার বুক।'

সুখের জন্য আত্মার ব্যাকুলতা, উৎপীড়িত চেতনার আর্তনাদ, স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্নভঙ্গের দ্বন্দ্বে আকীর্ণ 'গঙ্গা' উপন্যাস । শুধু মহাজন আড়তদার নয়, পাইকারি বা সাধারণ খুচরো ক্রেতাদের হাতেও নানাভাবে প্রতাড়িত হয় জেলে মাঝিরা । এখানে আমরা ফড়েনী দামিনী বা আতরবালার কথা উল্লেখ করতে পারি । উপন্যাসে উল্লেখিত আছে, 'পাইকের মহাজনের জাত নেই । মেয়ে পুরুষ নেই তার । সে পারলে তোমাকে ছেড়ে কথা কইবে না ।তবু দামিনী, নিবারণ ও পাঁচুর প্রতি, হিমি বিলাসের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়েছে তাতে ফড়েনীদের স্বাভাবিক প্রকৃতি অপেক্ষা প্রেমের টানই বেশি কাজ করেছে।

জেলে জীবনে নদীকে ভয় করা চলে না। এই মাছমারাদের প্রধান শত্রু হল সামন্ত মহাজন, শহুরে লগ্নিকারী আর সুন্দরবনের ডাকাত । তার উপর রয়েছে মধ্যস্বত্বভোগী ফড়ে পাইকারেরা । অদ্বৈত মল্লবর্মণও তিতাস পারের মাছমারাদের সমাজজীবনের চিত্রকে চিত্রিত করেছেন 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে । তিতাস পারের মালো সম্প্রদায়ের সঙ্গে ছিল অদ্বৈত মল্লবর্মণের আত্মিক সম্পর্ক। নিম্নবর্গের এই সামগ্রিক জীবনকে, সহানুভূতিশীল হৃদয় নিয়ে, তাদের কাছ থেকে নয়, তাদেরই একজন হয়ে উপলব্ধি করেছেন মালোসম্প্রদায়ভুক্ত লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তাই তিতাস পারের মালো সমাজের সঙ্গে সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'র মাছমারা সমাজের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এই নিগৃহীত অবস্থার মধ্যে থেকে নিম্নবর্গীয় মানুষ যে ভাষায় কথা বলেছে, যেভাবে প্রতিষ্ঠানকে দেখেছে এবং বর্ণনা করেছে তা কতখানি সমরেশ বসুর নিজের আর কতখানি সমরেশ বসুর আরোপিত। মনে হয় শ্রেণিগতপার্থক্যের জন্যই সমরেশ বসুর পক্ষে

হয়তো পুরোপুরিভাবে নিম্নবর্গীয়দের চেতনাবৃত্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি । এ প্রসঙ্গে আমরা এখানে অন্যান্য নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের কথা আলোচনা করতে পারি। সমাজের নিঁচুতলার মানুষকে নিয়ে লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক জনপ্রিয় নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'। এই উপন্যাসের মধ্যে লেখক অধীন বর্গের নিগৃহীত অবস্থানকে অসাধারণ দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন। জেলে পাড়ার বিবরণ দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেছেন, "স্থানের অভাব এ জগতে নাই । তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই। সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলে পাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না। একটি কুড়ের আনাচে কানাচে তারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুড়ে উঠিতে পায়। পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে।"[৪] এখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চবর্গের 'অপর' হিসেবে নিম্নবর্গের প্রত্যাখ্যাত জগৎকে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি ও মানুষের নানাবিধ পরিবর্তন ঘটলেও কিন্তু অপরিবর্তিত থাকে অন্তেবাসীবর্গের অবস্থান; "জেলে পাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না । ক্ষুধা তৃষ্ণার দেবতা, হাসি কান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না।"[৫]

সমাজের প্রতিচ্ছবি সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয় । আর নিম্নবর্গীয়রা যেহেতু সমাজের অঙ্গ তাই তাদেরকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। নিম্নবর্গীয় চেতনার পাঠ সন্ধানের ক্ষেত্রে আরেকটি নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' একটি সম্ভাবনাময় প্রতিবেদন। হাঁসুলী বাঁকের কূলে গড়ে ওঠা কাহারদের সমাজজীবনকে লেখক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিঁনি হাঁসুলী বাঁকের কাহারদের দেখেছিলেন অত্যন্ত কাছ থেকে। বাঁশবাদীর কাহারেরা সদগোপ জোতদারদের ভূমিদাস । কাহারদের মধ্যে এ ধরণের ধারণা ছিল যে যারা পূণ্যাত্মা-'কালারুদ্দু' তাদের 'ছিষ্টি' করলেন 'বাম্ভন', সদগোপ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের মানুষরূপে আর যারা পূর্বজন্মে পাপ করেছে তাদের পাঠালেন কাহার বানিয়ে । ব্রাহ্মণ্যবর্গের গড়া রীতি নীতি কাহারেরা বিনা দ্বিধায় মেনে নেয় । বাবুদের পালকিতে নিয়ে যাবে, ভৃত্যের কাজ করবে, জমি চাষ করবে কাহারেরা, কাহার কন্যারা হবে বাবুদের ভোগের বস্তু - এ হল সমাজের বাস্তব সত্য।

সমরেশ 'গঙ্গা' উপন্যাসে গঙ্গা নদীর সঙ্গে মাছমারাদের জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । আষাঢ়ে নতুন করে মুচলেকা দিয়ে নৌকো ছাড়িয়ে আনতে হয় মহাজনের কাছ থেকে এবং অম্বুবাচির পরই ইলিশের খোঁজে নৌকো ভাসাতে হয়। ধলতিতা , তেঁতুলিয়া, সারাপুল, পুরোখোঁড়গাছি, ফতুল্লোপুর, ফরিদকাঠি, বীরপুর তাবৎ পূর্ব দক্ষিণ দিকের কৈবর্ত , নিকিরী , চুনুরী , মালো প্রভৃতি মৎস্যজীবীরা নোনা জলের খাল, বিল, পার হয়ে মিঠে জলের উদ্দেশ্যে গঙ্গায় যায় । কারণ তাদের কাছে গঙ্গাই অগতির গতি । মাছমারাদের ভাত কাপড় বাঁধা আছে গঙ্গার কাছে । তাই যার নৌকা নেই, তারা মহাজনের কাছ থেকে নৌকা ভাড়া নিয়েও বর্ষায় পাড়ি দেয় । কারণ -'গঙ্গাই দেবে হাত ভরে না দিলে মরণ।'

বর্ষার মরশুম কাটিয়ে মৎস্যজীবীরা ঘরে ফিরে, টানের সময় আবার যাত্রা করে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে । সেখান থেকে কেউ ফেরে আবার কেউ ফেরে না । ঘরে ঘরে তাদের এত অভাব যে সমুদ্রে না গিয়ে তাদের কোন উপায় নেই । সমুদ্র বা গঙ্গা থেকে মাছমারারা যা রোজগার করে তার বেশির ভাগই চলে যায় মহাজনের খাতায়। ফলস্বরূপ তাদের জীবনে অভাব কোনোদিন দূর হয় না । গোষ্ঠীবদ্ধ মাছ মারা মালোরা নানা বিশ্বাস সংস্কারের বশবর্তী। পুরুষানুক্রমে তারা এসব মেনেও আসছে। কিন্তু উপন্যাসের নায়ক বিলাস যুক্তিহীন বিশ্বাস সংস্কারকে মানে না। অন্যদিকে মাছমারাদের টোটেম-ট্যাবু-বিশ্বাস- সংস্কারের লোকায়ত সমস্ত অনুপুঙ্খ নিয়ে হাজির হয়েছে পাঁচু এবং লেখক পাঁচুর দৃষ্টিকোনকে ব্যবহার করেছেন সবচেয়ে বেশি। উপন্যাসের নায়ক বিলাস কিন্তু সেই বিশ্বাসের জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে চায় । এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন আসে এই বেরিয়ে আসতে চাওয়া কি বর্গ থেকে ব্যক্তির দিকে সরে আসা? কৌম বাস্তবতা থেকে অনিকেত আধুনিকতায়, নিজ অভিজ্ঞানে? মাছমারাদের জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই, যে কোনো মুহূর্তে

তাদের বিপদ ঘনিয়ে আসে। তাদের জীবন, জীবন-মরণের দোটানায় বন্দী। জীবনে চলার পথে আছে ডাঙার অপদেবতা, আছে স্থলপথ ও জলপথের ডাকাত, ও আছে মরশুম অনুযায়ী মাছের আকাল-যা মাছমারাদের পথের ভিখারিতে পরিণত করে। তার উপরি সবলের শোষণ, অত্যাচার ও উৎপীড়ন। দরিদ্র মাছমারাদের এভাবেই জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে হয়। প্রকৃতির প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের বাঁচতে হয়। বিলাসের পিতা নিবারণ সাইদারকে জীবনে প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে অজানা রহস্যের অতলে নিজের জীবনকে বিসর্জন দিতে দেখি । মালোদের সমস্ত সংস্কার মেনেও আঠারো গণ্ডা নৌকার 'শাবর', দশকুড়ি জেলে নিয়ে সে বেরিয়েছিল সমুদ্রযাত্রায় । কিন্তু এই যাত্রাই তার কাল হয়ে দাঁড়ায় , সে আর ফিরে আসতে পারেনি। নিবারণের রহস্যজনক মৃত্যু তার স্ত্রীর জীবনকে ছাড়কার করে দেয়।

নিবারণের ছেলে বিলাস শুধু নিবারণের আদল নিয়ে জন্মায়নি, তার মধ্যেও আছে বাবার মতো শক্তি ও সাহস । বিলাস সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে প্রতিবাদ করতে জানে । এই প্রতিবাদ শুধু প্রকৃতির বিরুদ্ধে নয়, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে। তার বিপরীতে পাঁচুর মধ্যে রয়েছে চিরাগত সংস্কার। তার চিন্তায়, সংস্কারে যেমন রয়েছে মালো সমাজের দীর্ঘকালগত লোকায়ত মিথ-এর প্রভাব, আছে পেত্নির ধরা, ভুতপ্রেত, তেমনি পাঁজিপুথির অমোঘ বাণীর সূত্রে সে জগতে ঢুকে পড়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাবাদর্শ। সমরেশ বসু লোককথার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন মালোদের জল-অচল হওয়ার রহস্য। এখানে বর্ণবৈষম্যের প্রসঙ্গটি লেখক খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। উচ্চবর্ণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পাঁজি পুথিকে বিশ্বাস করে না বিলাস। তার মতে ব্রাহ্মণেরা শুধু পাঁজিই রচনা করেন না, তারা এখন যাজন ছেড়ে খাঁটি মহাজন হয়েছেন, এমনকি হয়েছেন মাছের আড়তদারও। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার ঘেরাটোপে লুকিয়ে থাকা শত্রু মিত্রদের সে ভালভাবেই চিনতে পারে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা শুধু মন্দিরের পুজারি হয়ে ক্ষান্ত হননি তারা এখন মাছের আড়তদার, তাই বিলাসের সঙ্গে তাদের ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক। যদিও বিলাসের বয়স কম, পাঁচুর মত সংসারের এতটা অভিজ্ঞতাও নেই, নেই বড় বিপদের সঙ্গে লড়াই-এর শিক্ষা, কিন্তু মানুষ সে ভালভাবেই চিনতে পারে, এবং তাদের ফাঁকিকেও বুঝতে পারে । পাঁজি পুথির ক্ষেত্রে তার প্রতিবাদী সত্তাকে আমরা দেখতে পাই। তার মতে, 'পাঁজি পুথির কথা ছাড়ান দেও । ওসব বাজার গরম কথা।' পাঁচু যখন পাঁজি পুথির স্বপক্ষে সালিশি করতে গিয়ে বলে 'মাঙনা মাঙনা' লেখা হচ্ছে? তখন বিলাস তার উত্তর দেয়,- 'মাঙনা হবে কেন? মাছের চে' কি পাঁজি বিক্কির কম হয়? .....যা আসবে তা আমার জালে আসবে পাঁজি লিখলেও আসবে, না লিখলেও আসবে। .....কোনওদিন ত দেখলাম না যে পাঁজি একেবারে অব্যথ কথা লিখছে।'[৬]

শ্মশানের সাধুবাবাকে সবাই অন্তর্জামী বলে মানলেও বিলাস কিন্তু তা মানতে রাজি নয় এবং তাকে নিয়ে নানা উপহাস করে। বিলাস চিরাচরিত বিশ্বাসকে উপেক্ষা করে সমুদ্র যাত্রার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে। আমাদের মনে প্রশ্ন আসে, এসব অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারের বাইরে বেরিয়ে আসা বিলাসের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নাকি সংস্কারমুক্ত লেখকের আরোপ? যদি বলি আরোপ, তাহলে মানতে হয়, যথাপ্রাপ্ত অবস্থান সম্পর্কে নিম্নবর্গের প্রশ্ন তোলা মাত্রেই তার উপর লেখকের ভাবাদর্শের আরোপ। পাঁচুর মধ্যে প্রতিবাদের যে ক্ষীণ সুর, সেই সুরকেই জীবন্ত করে তোলে বিলাস। এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-র বনোয়ারী এবং করালীর মধ্যে যে ধরণের সংঘাত, সে ধরণের সংঘাতের প্রতিফলন দেখতে পাই পাঁচু আর বিলাসের মধ্যে। বনোয়ারী পুরোনো ঐতিহ্যকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেও সফল হয়নি। আর পাঁচু বিলাসের সংঘাত তো ভাবাদর্শের সংঘাত ।

নিম্নবর্গের মানুষ তাদের নিজস্ব প্রথা সংস্কার অনুযায়ী চলতে বাধ্য। যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষেরই একটা নিজস্বতা আছে – সেটা তার ধর্ম-ঐতিহ্য-প্রথা-সংস্কার-সংস্কৃতিকে নিয়ে গড়ে ওঠে এবং নিজস্ব জায়গাটা মানুষের সব থেকে স্পর্শকাতর দুর্বলতার জায়গা। সমাজের উঁচুতলার মানুষেরা আধুনিক যুগের সভ্যতার বার্তাকে

সহজেই শুনতে পায় কিন্তু নিচু তলার মানুষেরা এসব থেকে বঞ্চিত। অনেক ক্ষেত্রে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকা সংস্থানের জন্য সভ্য সমাজের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ঘটে। ফলে শহুরে জীবনের সঙ্গে একটা টালমাটাল দোটানার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নতুন প্রজন্মের মানুষ তার বিদ্রোহী চেতনার বীজ বুকে নিয়ে এদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। বিলাসের মধ্যেও আমরা সেই মনোভাব দেখতে পাই।

বিভিন্ন সমালোচক বিলাসের সমুদ্র যাত্রার দার্শনিক ব্যাখ্যা করেছেন। 'গঙ্গা' উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে পার্থপ্রতিম উল্লেখ করেছেন যে এ উপন্যাস জেলেদের কাহিনিই নয়, এক মহাযাত্রার কাহিনি। তিনি নিঃসন্দেহে এখানে রোম্যান্টিক মহাযাত্রার কথা বলেছেন। আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করলে বিলাসের পক্ষে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়াই স্বাভাবিক। সে নিবারণ সাইদারের ছেলে, পিতার মত তার রক্তেও ছিল সমুদ্রে যাওয়ার তীব্র আকাঙক্ষা, নিবারণের মতোই সে গোঁয়ার, নিবারণও যাত্রাপথে কচ্ছপ দেখে বলেছিল, এর জন্য যাওয়া আটকাতে পারে না। সর্বোপরি বিলাসের ধারণা ছিল এক বার সমুদ্রে যেতে পারলে মহাজনের ঋণের কবল থেকে মুক্তি পেলেও পেতে পারে । সেই নিগৃহীত জীবন থেকে মুক্তির স্বাদ তার একান্ত কাম্য। সেজন্য সে হিমির সান্নিধ্যকে উপেক্ষা করতে দ্বিধা করে না। বিলাস অধীনতার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। সে কৌমচেতনার উপর থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী আচ্ছাদনটাকে সরিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছে । মহাজনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তার মন ছটফট করতে থাকে। তাই শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই বিলাস সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে, তবে একা নয়, কৌমদলপতি হয়েই, আঠারো গণ্ডা নৌকা শাবর করেছে রাইমঙ্গলের মোহনায় । সুতরাং বলতে পারি এ যাত্রা অনির্দেশ্য মহাযাত্রা নয়।

সমালোচক এই মন্তব্য করেছেন যে বিলাস বর্গ থেকে ব্যক্তির দিকে সরে গেছে তার সঙ্গে একমত হতে পারি না। আমরা বলতে পারি বিলাস যথার্থ অর্থেই বর্গ নায়ক, তার মধ্যে দিয়ে শ্রেণি-বর্গ-বর্ণ উপেক্ষিত সমাজের অন্তেবাসী বর্গের নিজস্ব উচ্চারণ, প্রতিভাবাদর্শের স্বর নৈঃশব্দের চক্রান্ত পেরিয়ে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেছে। দেবাশিষ ভট্টাচার্যের মতে, 'নির্বিকল্প প্রভুত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো বিলাস সাগর থেকে ফিরে কি রেহাই পাবে তার জীবনের জ্বালা, অধীনতার গ্লানি থেকে? নিশ্চয়ই না, তবু, এই দাঁড়ানোতেই সে অনন্য, মধ্যবিত্তের আপসকামিতার বিপরীত এই বলিষ্ঠতার জন্যই বিলাস, করালীকে মনে করিয়ে দেয়। যদিও পাঠক জানেন, যে পাঠক সমাজবিদ্যার ছাত্র, বিলাসের পরিণতি করালীর মতোই স্বপ্নভঙ্গের ইশারায় শেষ হবে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের এই হলো বাস্তবতা।'[৭]

সমরেশ বসু এই নিম্নবর্গীয় মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তাই নিম্নবর্গীয় মৎস্যজীবীদের সমাজ জীবনের চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর 'গঙ্গা' উপন্যাসে। বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় মাছমারাদের নিয়ে লেখা উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম 'গঙ্গা' । সমরেশ বসুর লেখার মধ্যে ফুটে ওঠেছে বৈচিত্রময় ব্যক্তিজীবনের প্রতিফলন। ড. নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'তাঁর জীবনটাই ছিল এক অদ্ভুদ জটিল ঘটনা বহুল উপন্যাসের মত। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা যেমন তাঁর নেশা, তেমনি সেই মানুষকে নিয়ে লেখাই হয়ে উঠল তাঁর একমাত্র পেশা। আর সে মানুষ মূলত সমাজে অপাংক্তেয়, ব্রাত্য, কিন্তু জীবনরসে ভরপুর, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ উচ্চকণ্ঠ, দুঃসাহসী অভিযাত্রায় নিঃশঙ্ক। জীবন গ্রন্থের বিবর্ণ উপেক্ষিত পৃষ্ঠাগুলিরই তিঁনি ছিলেন নিবিড় মনোযোগী পাঠক। এই তাঁর কথা সাহিত্যে ভিড় করেছে জেলে, মালো, বস্তিবাসী, কারখানার শ্রমিক, দরিদ্র দিনমজুর পশারিণীর দল, সমাজের অচ্ছুত, অন্ত্যজ সম্প্রদায়।'[৮]

সূত্র নির্দেশঃ—

১। চট্টোপাধ্যায়, পার্থ; "ভূমিকাঃ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার ইতিহাস"; 'নিম্নবর্গের ইতিহাস'; গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা ১৯৯৩, পৃ: ৩
২। সমরেশ বসু রচনাবলী ২, সম্পাদনা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় , আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ২য় মুদ্রণ, জুন ২০০০, পৃ: ২৩০-২৩১
৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', পৃ: ৭৭০
৪। মানিক গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮২ পৃ: ৮
৫। ঐ, পৃ: ৮
৬। সমরেশ বসু রচনাবলী ২, কলকাতা ১৯৯৮, পৃ: ২১৭-২১৮
৭। ভট্টাচার্য, দেবাশিস; 'বিশ শতকের বাংলা কথা সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা' অক্ষর পাবলিকেশন, ত্রিপুরা ২০১০, পৃ: ২৫০
৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নিমাই, 'প্রাক বিবর পর্বে সমরেশ বসু', ১ম প্রকাশ ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৯, পৃ: ৩